সে যে সব হতে আপন আমাদের শান্তিনিকেতন

- সেৎসু তোগাওয়া (মাকিনো)

আমি যখন প্রথম শান্তিনিকেতনে যাই বাবার কাজের সূত্রে, তখন আমার পাঁচ কি ছয় বছর বয়স। এক ফোঁটাও বাংলা জানতাম না। তার আগে গোয়া ও গুজরাতে ছিলাম বলে কিছুটা হিন্দী, ইংরেজী, কোঙ্কানী (গোয়ার স্থানীয় ভাষা) বলতে পারতাম, বুঝতাম। কিন্তু জাপানী কতটা বুঝতাম ঠিক মনে নেই।

শান্তিনিকেতনের কথা লিখতে গেলে সবথেকে বেশী মনে পড়ে পাঠভবনের দিনগুলির কথা। পাঠভবন হল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবন বা আশ্রমের আর্দশে বিদ্যালয় শুরু করেছিলেন। আমি পাঠভবনের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হলাম। একেই গোয়া থেকে শান্তিনিকেতনের নতুন পরিবেশ (পশ্চিম থেকে পূর্বে), তার উপর বাংলা একদম অজানা ভাষা, তাই নতুন জায়গায় মানিয়ে নিতে কিছুটা তো সময় লেগেছিল। প্রথম ছ মাস স্কুলে গিয়ে শুধু বসে পড়া শুনতাম। প্রথম থেকে অ আ ক খ অভ্যাস করে ঠিক কবে থেকে যে বাংলায় লিখতে পড়তে বুঝতে ও কথা বলতে ও সকলের সঙ্গে communicate করে উঠতে পেরেছি, মনে পড়ে না। ছোট ছিলাম বলে হয়ত চট্ করে শিখতে পেরেছিলাম।

আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় মুহূর্ত ছিল পাঠভবনের দিনগুলি। গাছের ছায়াতে ক্লাস, প্রকৃতির সান্নিধ্য, নাচ, গান, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বন্ধু-বান্ধব, পড়াশুনা -- সব মিলিয়ে স্কুলজীবন যে এত আনন্দের, সেটা পাঠভবন বলেই হয়ত অনুভব করতে পেরেছি। সারা বছর ভোর সাড়ে ছটায়, শুধু শীতকালে সাতটায় ক্লাস শুরু হত। তার আগে বৈতালিক দিয়ে দিনের সূচনা হত। "ওঁ পিতা নোহসি পিতা নো বোধি --- " মন্ত্রপাঠ করে একটা পূজা পর্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে যে যার ক্লাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতাম। সিংহসদনের ঘন্টা আমাদের ক্লাসের শুরু ও শেষ জানাত। যে কোনও অনুষ্ঠানের সূচনাতেও এই ঘন্টা বাজান হত। বেশ দূর থেকে এই ঘন্টার ঢং ঢং আওয়াজে বুঝতে পারতাম কিছু শুরু হতে যাচ্ছে।

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা -- সারা বছরই আমরা মোটামুটি বাইরেই ক্লাস করেছি। সুতরাং প্রকৃতি ও ছয় ঋতুকে আমরা অত্যন্ত কাছে পেয়েছি। পাঠভবন তৈরি হয়েছে বিস্তৃত জায়গা নিয়ে। নানা রকম গাছ রয়েছে পাঠভবনের প্রাঙ্গণে। সেই অনুযায়ী প্রত্যেকটি স্থানের আলাদা আলাদা নাম, যেমন আম্রকুঞ্জ, শালবীথি, বকুলবীথি, মাধবীবিতান, গৌরপ্রাঙ্গণ, ঘন্টাতলা ইত্যাদি। আশ্রমে নানারকম

ফলের গাছ থাকায় প্রায়ই আমলকী, কাঁচা আম, কুল, বকুল, খীরকুল, বয়রা, পাতাবাদাম ইত্যাদি কুড়িয়ে খেতাম।

ছোটবেলায় আমার একটা প্রিয় ক্লাস ছিল প্রকৃতিপাঠ। এর কোনও পাঠ্যপুস্তক ছিল না। মাষ্টার মশাই মুখে মুখে প্রকৃতি, গাছ, পাতা, ফুল, পাখি-- আমাদের চারপাশের পরিবেশ সম্বন্ধে বলে শোনাতেন, আর প্রায়ই বেড়াতে নিয়ে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করাতেন। এই ক্লাসে আমরা অনেকবার উত্তরায়ণে গিয়ে নতুন রকমের উদ্ভিদ দেখেছি।

পাঠভবনের আরেকটা বৈশিষ্ট্য এই যে ২য় শ্রেণী থেকেই পড়াশুনার বাইরে নাচ, গান (রবীন্দ্রসঙ্গীত) ও হাতের কাজ, কাঠের কাজের ক্লাস রয়েছে। শান্তিনিকেতনে সারা বছর ধরে ঋতুকে কেন্দ্র করে নানা উৎসব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, আর উৎসব-অনুষ্ঠান মানেই নাচ, গান, নাটক। যেহেতু নাচ আমার ভাল লাগত, তাই আমি ছোটবেলা থেকেই এই উৎসব-অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ করে এসেছি। বসন্তকালে বসন্তোৎসব, বৈশাখ মাসে নববর্ষ, রবীন্দ্র জন্মোৎসব, বর্ষাকালে বর্ষামঙ্গল, বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ, শরৎকালে শারদোৎসব ইত্যাদি। তাছাড়া পাঠভবনের ছেলেমেয়েরা প্রতি মঙ্গলবার "সাহিত্য-সভা" করে নিজেদের লেখা রচনাপাঠ, আবৃত্তি, গান ও নাচ পরিবেশন করে। তাই সারা বছরের মধ্যে প্রায় অর্ধেক সময় রিহার্সাল দিতে ব্যস্ত থাকতাম। এই রিহার্সালের মাধ্যমেও নাচের অনেক কিছু শিখেছি। নিজে অংশগ্রহণ করিনি যখন তখনও রিহার্সাল দেখতে খুব ভাল লাগত। শান্তিনিকেতনে ছিলাম বলেই মোহরদি (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়), শান্তিদা (শান্তিদেব ঘোষ), বাচ্চুদি (নীলিমা সেন) এঁদের সান্নিধ্যে কয়েকবারই নাচ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। মোহরদির বাড়িতে কত রিহার্সাল দিয়েছি। শান্তিদার ৭০ বছর বয়সের জন্মদিনে উনি "বাল্মীকি

প্রতিভা" করিয়েছিলেন । উনি নিজে গান গেয়ে অভিনয় করে বাল্মীকির ভূমিকাটি করেছিলেন আর আমি বনদেবীর একজন হয়ে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলাম । বাচ্চুদি আমাদের দিল্লীতে "চণ্ডালিকা" করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন । তাঁদের স্নেহাশীর্বাদ আর এইসব অভিজ্ঞতা আমার জীবনে অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে ।

প্রত্যেক বছর পাঠভবন থেকে পাশ করার আগে দশম শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা নববর্ষের সন্ধ্যায় গুরুদেবের নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করে । এটি একটি পরম্পরাগত ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে । আমাদের সময় "চিত্রাঙ্গদা" করেছিলাম, এবং সেটি পরিচালনা করেছিলেন আমাদের অধ্যক্ষের স্ত্রী শুভ্রাদি । আমরা কয়েক মাস ধরে প্রস্তুত হয়েছিলাম । শুভ্রাদি ওনার পূর্ণ উৎসাহ, আগ্রহ, ভালবাসা দিয়ে আমাদের তৈরি করিয়েছিলেন । শান্তিনিকেতনে কোনো অনুষ্ঠান হলে নানান দিক থেকে সহযোগিতা করার লোকের অভাব হয় না । গান-বাজনা, সাজ-পোশাক, গয়না, মঞ্চসজ্জা -- সব ব্যবস্থাই হয়ে যায় অনায়াসে । একটা বড় শিক্ষা আমি শান্তিনিকেতনে পেয়েছি, তা হল অনাড়ম্বর সাজ । নাচের সময়ও একদম জমকালো সাজগোজ করতাম না । সাধারণ তাঁতের শাড়ি, হাতায় স্বহস্তে এমব্রয়ডারি করা ব্লাউজ, ফুল-পাতা দিয়ে তৈরি গয়না । কাঁঠাল পাতা, টগর ফুল, আকন্দ ফুল, রঙন ইত্যাদি চারপাশের ফুল দিয়ে যে কী সুন্দর গয়না তৈরি করা যায়, সেটা বোধহয় শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরাই জানে । বেশীরভাগ অনুষ্ঠানও খোলা মঞ্চেই অনুষ্ঠিত হয় ।

এইভাবে শান্তিনিকেতনে আমার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে

নাচ-গান যুক্ত হয়ে গিয়েছিল । অনুষ্ঠান হলেই ডাক পড়ত । জাপানে সেই পরিবেশটা নেই বলে, এত বিলাস ও সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও মাঝে মাঝে জীবন রসহীন লাগে ।

এখন আমি হিরোশিমাতে থাকি, কিন্তু প্রতিবছর শান্তিনিকেতনে যাই । আমার বাবা ৺শ্রী সাইজি মাকিনোও তাঁর দু বছরের ছাত্রজীবনে অর্জিত অভিজ্ঞতার আকর্ষণেই হয়ত কাজ পেয়ে আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়েছিলেন । বিশ্বভারতী থেকে অবসর নেবার পরও জাপানে ফিরে না এসে শেষজীবন পর্যন্ত শান্তিনিকেতনেই কাটিয়েছিলেন । শান্তিনিকেতন সকলকে আপন করে নেয় । সেই টানেই হয়ত দেশ-বিদেশ থেকে এত লোক শান্তিনিকেতনে একত্রিত হন পড়াশুনার কাজে, গবেষণার কাজে ও অন্যান্য উদ্দেশ্য নিয়ে । ❑

চলো, চলো, চলো । ঝরনার মতো চলো, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো চলো, প্রভাতের পাখির মতো চলো, অরুণদয়ের আলোর মতো চলো । সেইজন্যই তো পৃথিবী এমন বৃহৎ , জগৎ এমন বিচিত্র, আকাশ এমন অসীম ।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পথের সঞ্চয়)